□

৩২.০ উদ্দেশ্য

৩২.১ প্রস্তাবনা

৩২.২ রাজনীতিতে সামরিক প্রভাব বৃদ্ধির অনুকূলতা

৩২.৩ সামরিক বাহিনীর বিশিষ্টতা

৩২.৪ সামরিক বাহিনীর রাজনৈতিক ভূমিকা ও তার নির্ধারক

৩১.৫ রাজনীতিতে সামরিক বাহিনীর ভূমিকার বিভিন্ন রূপ

৩২.৫.১ রাজনীতিতে সামরিক বাহিনীর প্রচ্ছন্ন ও সীমিত হস্তক্ষেপ

৩২.৫.২ সামরিক বাহিনীর প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ

৩২.৫.৩ পূর্ণাঙ্গ সামরিক শাসন

৩২.৬ সারাংশ

৩২.৭ অনুশীলনী

৩২.৮ গ্রন্থপঞ্জী

৩২.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে জানা যাবে—

- রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও প্রক্রিয়ার সাথে সামরিক বাহিনীর সম্পর্ক।
- রাজনৈতিক বাহিনীর স্বাতন্ত্র্যসূচক বিশিষ্টতা।
- রাজনীতিতে সামরিক বাহিনীর ভূমিকার নির্ধারক উপাদান।
- সামরিক প্রভাব ও হস্তক্ষেপের বিভিন্ন রূপ।

সাধারণভাবে রাজনীতি ও সামরিক বাহিনী দু'টি আপাত বিচ্ছিন্ন বিষয় বলে গণ্য হয়।

প্রতিটি সুসংগঠিত মানবসমাজে ক্ষমতা বা কর্তৃত্বের একটা কাঠামোগত বিন্যাস থাকে। এই কাঠামোগত বিন্যাস ও তৎসংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়াসমূহের অনুশীলনকেই সংক্ষেপে আমরা রাজনীতি নামে চিহ্নিত করি। রাজনীতির এই অনুশীলনে সামরিক বাহিনীর ভূমিকা প্রত্যক্ষভাবে অনুভূত হয় না।

ক্ষমতা বা কর্তৃত্বে এই কাঠামোগত বিন্যাস ও সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়াসমূহের প্রতি জনগণের ব্যাপক অংশের মধ্যে এক স্বাভাবিক অনুমোদন বা স্বীকৃতি গড়ে ওঠে যা ঐ রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে বৈধতা দান করে। কিন্তু কখনও কখনও এই রাজনৈতিক বৈধতার ক্ষেত্রেও সঙ্কট সৃষ্টি হয়। ফলে ক্ষমতার কাঠামোগত বিন্যাস ও সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়াটিকে টিকিয়ে রাখতে তখন প্রয়োজন হয় বল প্রয়োগের এক অতি সুসংগঠিত ও সুশিক্ষিত বাহিনী যা রাজনৈতিক ব্যবস্থার স্থায়িত্বের পক্ষে এক অপরিহার্য প্রতিষ্ঠান।

আধুনিক রাষ্ট্রে, বিশেষত একালের গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার অধীনে যাঁরা বাস করেন তাঁদের ধারণায় রাজনীতি ও সামরিক বাহিনীর সম্পর্ক সচরাচর তেমন স্পষ্ট ও প্রকাশ্য নয়। বরং, একালের লৌকিক ধারণায় সামরিক বাহিনীর এক রাজনীতি নিরপেক্ষ ভাবমূর্তি বর্তমান। তুলনায়, এ দুইয়ের মধ্যে কিছু প্রচ্ছন্ন ও কিছু স্পষ্ট সম্পর্ক সেইসব দেশের মানুষের অভিজ্ঞতা ও চেতনায় ধরা পড়ে যেখানে হয় সরাসরি সামরিক শাসন প্রতিষ্ঠিত আছে অথবা যেখানে অসামরিক শাসকগোষ্ঠী তাঁদের স্বৈরাচারী আধিপত্য বজায় রাখতে প্রায়শই সামরিক বাহিনীর সাহায্য নিয়ে থাকেন।

বস্তুত, সাবেকি ধারণা অনুসারে সামরিক বাহিনী হল রাজনৈতিক প্রক্রিয়াসমূহের সঙ্গে সম্পর্কশূন্য এমন এক স্বতন্ত্র ও নিরপেক্ষ সংগঠন যা অসামরিক সরকারের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীনে সংগঠিত ও পরিচালিত হয়ে দেশের ভূখণ্ডগত প্রতিরক্ষার দায়িত্ব সম্পাদন করে এবং বিশেষ প্রয়োজনে আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখতে পুলিশ বাহিনীকে সাহায্য করে।

কিন্তু এই সাবেকি ও প্রচলিত ধারণা আধুনিক কালের অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে যথার্থ ও গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয় না। বর্তমানে বহু দেশেই অসামরিক সরকারের অস্তিত্ব ঐসব দেশের সামরিক বাহিনীর সক্রিয় সমর্থনের উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। বিগত অর্ধ শতাব্দিকালে বিশ্বের নানা দেশের রাজনীতিতে সামরিক বাহিনীর প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ বা পরোক্ষ প্রভাব বিস্তারের ঘটনা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগেই পূর্ব ইউরোপের কয়েকটি দেশে এবং স্পেন ও জাপানে এরকম ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীকালে এজাতীয় ঘটনা ঘটতে লাগলো তৃতীয় দুনিয়ার নানা সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশে। এশিয়া, আফ্রিকা এবং মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকার নানা দেশে অসামরিক সরকার, সামরিক বাহিনীর দ্বারা ক্ষমতা থেকে অপসারিত হয়েছে, অথবা এক অসামরিক সরকারের বদলে অন্য এক অসামরিক সরকার ক্ষমতাশীন হয়েছে সামরিক বাহিনীর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ মদতে। এ প্রসঙ্গে Alan R. Ball-এর মন্তব্যটি : "The lengthy list of successful or unsuccessful direct intervention by the military....since 1945 creates the impression that seizure of political control by the armed forces, or the military ensuring the replacement of one civilian government by another, is the norm rather than the exception in modern political systems."

Fred R Vonder Mehden তাঁর The Politics of Developing Nations গ্রন্থে একটি উল্লেখযোগ্য তথ্য সরবরাহ করেছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর স্বাধীনতাপ্রাপ্ত ৭৫টি দেশের মধ্যে প্রায়

২৫টিতেই সফল সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে রাজনৈতিক পটপরিবর্তন সংঘটিত হয়েছে। Joseph La Palambara তাঁর Politics within Nations গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, ১৯৪৫ সাল থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত আফ্রিকা মহাদেশের আভ্যন্তরীণ সংঘর্ষের প্রায় ৭১ শতাংশ সামরিক অভ্যুত্থানের সাথে জড়িত। অনুরূপভাবে এশিয়া মহাদেশের ৪২ শতাংশ এবং লাতিন আমেরিকার ৫২ শতাংশ আভ্যন্তরীণ সংঘর্ষ সামরিক অভ্যুত্থানের সাথে জড়িত।

অধ্যাপক S. E. Finer তাঁর Comparative Politics গ্রন্থে এবং Jean Blondel তাঁর Comparative government গ্রন্থে এ বিষয়ে সপ্রসঙ্গ বিশদ আলোচনা করেছেন। অধ্যাপক Finer-এর মতে, তৃতীয় বিশ্বের দুর্বল ও অনগ্রসর দেশগুলিতেই সামরিক হস্তক্ষেপের সুযোগ সম্ভাবনা অধিক। অবশ্য, পশ্চিমের অগ্রসর দেশগুলির রাজনীতিক প্রক্রিয়া যে সামরিক বাহিনীর প্রভাব থেকে মুক্ত এমন নয়। Finer এ প্রসঙ্গে যুদ্ধপূর্ব জার্মানী, জাপান, ফ্রান্স, স্পেন ও পূর্ব ইউরোপের বিভিন্ন দেশের নানা দৃষ্টান্তের কথা উল্লেখ করেছেন। বস্তুত Finer-এর স্পষ্ট মত হল, রাজনীতিতে সামরিক হস্তক্ষেপের বিষয়টি তৃতীয় দুনিয়াতেই শুধু নয়, বিশ্বের প্রায় অধিকাংশ দেশের প্রচলিত রাজনীতিক ব্যবস্থায় এক স্বাভাবিক প্রবণতা। তবে পার্থক্য এই যে, রাজনীতিতে সামরিক বাহিনীর হস্তক্ষেপ বা প্রভাব বিস্তার তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে যতটা প্রত্যক্ষ ও প্রকট অন্যত্র তুলনায় তা অনেকখানি প্রচ্ছন্ন।

(Autonomous Characteristics)

যে-কোনও আধুনিক রাজনৈতিক সমাজে বহুবিধ প্রভাবশালী গোষ্ঠী ও সম্প্রদায় তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তিকে বজায় রাখতে ও বৃদ্ধি করতে নিজেদের সাংগঠনিক রূপ দেয়। এইভাবেই নানা চাপসৃষ্টিকারী ও স্বার্থগোষ্ঠী আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থার অভ্যন্তরে জন্ম নেয় ও ধীরে ধীরে বৈধতা অর্জন করে। রাজনৈতিক ব্যবস্থার সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ার উপর নানাভাবে চাপ সৃষ্টি করা ও প্রভাব বিস্তার করার মাধ্যমে এইসব সুসংগঠিত গোষ্ঠীগুলি রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এইরকমই এক সুসংগঠিত ও প্রভাবশালী গোষ্ঠী হিসেবে দেশের রাজনীতিতে সামরিক বাহিনীর বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকা সত্ত্বেও উপরোক্ত প্রভাবশালী গোষ্ঠীগুলির সাথে সামরিক বাহিনীর লক্ষ্যণীয় পার্থক্য বর্তমান।

প্রথমেই মনে রাখা দরকার যে, আধুনিক রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে সাধারণভাবে যেসব চাপসৃষ্টিকারী বা স্বার্থগোষ্ঠীগুলি সক্রিয় থাকে তাদের গড়ে তোলার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের কোনও প্রত্যক্ষ বা প্রাথমিক ভূমিকা নেই; তারা সংগঠিত হয় নিজস্ব উদ্যোগে। পক্ষান্তরে সামরিক বাহিনী রাষ্ট্রের নিজস্ব প্রয়োজনে এক অতি অপরিহার্য ও প্রভাবশালী সংগঠন হিসেবে গড়ে ওঠে।

সামরিক বাহিনীর এই বিশেষত্বটি ছাড়াও এর প্রকৃতি ও সংগঠনগত বিশেষত্বগুলিকে বিশ্লেষণ করলেই এটা অনুধাবন করা সহজ হবে কেন আধুনিক রাষ্ট্রে অন্য যে-কোনও প্রভাবশালী গোষ্ঠীর তুলনায় সামরিক বাহিনী রাজনৈতিক ক্ষমতা ও প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করা, এমনকি তাকে কুক্ষিগত করার ব্যাপারে অনেক বেশি সুবিধাজনক অবস্থানে থাকে।

লক্ষ্যণীয় হল, বর্তমানের সবরকম রাজনৈতিক ব্যবস্থাতেই সামরিক বাহিনী অন্যান্য কিছু বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। এই বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত চারিত্রলক্ষণগুলি Finer, Lucian Pye ও Alan Ball প্রমুখ রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের দ্বারা বিশ্লেষিত হয়েছে।

(১) সামরিক বাহিনীর সাংগঠনিক কাঠামো ক্রমোচ্চ স্তরে বিন্যস্ত এবং কেন্দ্রবদ্ধ (hierarchical & centralized)। এখানে প্রতিটি সদস্যের অবস্থান সর্বোচ্চ থেকে সর্বনিম্ন পর্যন্ত বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত। প্রতিটি স্তরের সৈনিক ও কর্মীদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সুনির্দিষ্ট। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আদেশ-নির্দেশ নিঃশর্তে মেনে চলতে অধস্তন কর্তৃপক্ষ বাধ্য থাকে। সাংগঠনিক কাঠামোর দিক থেকে তাই সামরিক বাহিনীর সাথে আমলাতন্ত্রের সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। কিন্তু ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আদেশ-নির্দেশ এবং তা পালনের ক্ষেত্রে অধস্তনের বাধ্যতা সামরিক বাহিনীর মতো এত কাঠোরভাবে আমলাতন্ত্রে অনুসৃত হয় না।

প্রকৃত বিচারে সামরিক বাহিনীর কঠোর নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলা রীতিমতো চরম ও দৃষ্টান্তমূলক। শৃঙ্খলা, নিয়মানুবর্তিতা ও বিনা বাক্যব্যয়ে উচ্চতর কর্তৃপক্ষের আদেশ-নির্দেশ পালন ইত্যাদির ক্ষেত্রে সামরিক বাহিনীর বিধিব্যবস্থা হল অত্যন্ত কঠোর ও আপসহীন। কঠোর শৃঙ্খলা ও আচরণবিধি অমান্য করার অভিযোগে বিশেষ সামরিক আদালতে অভিযুক্ত সদস্যের বিচার হয় ও কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা হয়। অন্য কোনও সামাজিক গোষ্ঠী—তা সে যত ক্ষমতাশালীই হোক না কেন নিয়মশৃঙ্খলা ভঙ্গের জন্যে খুব বেশি হলে দোষী সদস্যের সদস্যপদ কেড়ে নিতে পারে, কিন্তু তাকে কোনওভাবে দৈহিক শাস্তিদানের ক্ষমতা তার নেই। এ ব্যাপারে সামরিক বাহিনী অনন্য ক্ষমতার অধিকারী।

(২) দ্বিতীয়ত, সমাজের অন্যান্য ক্ষমতাশালী গোষ্ঠীগুলির সাথে তুলনায় সামরিক বাহিনীর সবচেয়ে বড় পার্থক্য হল সমাজের স্বাভাবিক জীবনধারার সাথে সামরিক বাহিনীর জীবনধারার কোনও সংযোগ বা সঙ্গতি থাকে না। সামরিক বাহিনীর সদস্যরা সাধারণ জনজীবন থেকে বিচ্ছিন্নভাবে নির্দিষ্ট ব্যারাকে বসবাস করে। তাদের পোশাক-আশাকে ও আদব-কায়দায় বৈশিষ্ট্যসূচক স্বাতন্ত্র্য ও সমরূপতা লক্ষ্য করা যায়। সর্বোপরি তাদের বিশেষ এক ধরনের ঐতিহ্যের প্রতি অনুগত করে গড়ে তোলা হয়। ("The armed forces in varying degrees emphasise their separation from civilian society by separate barracks, distinctive uniforms and indoctrination of recruits in the history and traditions of that particular branch of armed forces, resulting in a pride in the tradition and a distinct esprit de crops."—Alan R. Ball)

স্বাভাবিক জনজীবন থেকে এই বিচ্ছিন্নতা ও স্বাতন্ত্র্যময়তার দরুন সামরিক বাহিনীর সদস্যরা নিজেদের পৃথক গোষ্ঠীভুক্ত বলে মনে করে। জনজীবন থেকে এই বিচ্ছিন্নতার মাধ্যমে সামরিক বাহিনী নিজেদের মধ্যে এক ভিন্নধর্মী শৃঙ্খলাপরায়ণ সংস্কৃতি ও মানসিকতা গড়ে তোলে যা স্বভাবতই তাদের মধ্যে স্বতন্ত্র গোষ্ঠীচেতনার জন্ম দেয়।

(৩) দেশের অখণ্ডতা ও নিরপত্তা রক্ষায় বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিহত করতে সামরিক বাহিনীর অপরিহার্যতা ও তার দুঃসাহসিক ভূমিকার দরুন সামরিক বাহিনী কর্তব্যনিষ্ঠা দেশপ্রেমের প্রতীকে পরিণত হয়। এই বাহিনীর মধ্যে যে অভিপ্রেত মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তোলা হয় তার ফলে ধরে নেওয়া হয় যে, এই গোষ্ঠী সমাজের যে-কোনও সংকীর্ণ কায়েমি স্বার্থ বা গোষ্ঠীস্বার্থের ঊর্ধ্বে অবস্থান করে। সাধারণ জনমানসে তাই সামরিকবাহিনী হল স্বদেশপ্রীতি ও আত্মত্যাগের মূর্ত প্রতীক। এই ভাবমূর্তির কারণে সামরিক

বাহিনীকে সামগ্রিক জাতীয়স্বার্থের রক্ষক ও জাতীয় সংহতির পৃষ্ঠপোষক বলে মনে করা হয়। শুধু জনমানসেই নয়, সামরিক বাহিনীর নিজস্ব গোষ্ঠীগত চেতনাতেও এ জাতীয় ধারণা বেশ প্রবল যে খণ্ড খণ্ড গোষ্ঠীস্বার্থের সংঘাতে বিপন্ন সমগ্র দেশের ও জাতীয় স্বার্থকে তারাই যথার্থভাবে রক্ষা করতে বা উদ্ধার করতে পারে।

(৪) বিদেশী আক্রমণ প্রতিহত করতে এবং দেশের নিরাপত্তা রক্ষা করতে এবং প্রয়োজনে আভ্যন্তরীণ গোলযোগ বা গৃহযুদ্ধ মোকাবিলা করতে সামরিক বাহিনী বলপ্রয়োগ ও হিংসার সমস্ত হাতিয়ারের উপর একচেটিয়া অধিকার কায়েম করে। সামরিক বাহিনীর এই অধিকার বৈধ অধিকার হিসেবে সমাজে ও রাষ্ট্রে স্বীকৃত হয়। আর এই স্বীকৃতি ও বৈধতার পিছনে আছে রাষ্ট্রীয় প্রাধিকারের অলঙ্ঘনীয় ধারণাটি। আর যেহেতু রাষ্ট্রীয় প্রাধিকার প্রতিষ্ঠায় শেষ পর্যন্ত সামরিক বাহিনীই চূড়ান্ত অবল¥¤ন তাই রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় সামরিক বাহিনীর অনুপ্রবেশ বা হস্তক্ষেপ কিছুটা স্বাভাবিক বলে প্রতিপন্ন হয়।

(৫) অন্যান্য প্রভাবশালী সামাজিক গোষ্ঠীর সাথে সামরিক বাহিনীর একটি লক্ষ্যণীয় পার্থক্য হল সামাজিক গোষ্ঠীগুলি স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক কাজকর্মে অংশগ্রহণ করতে পারে এবং করে। চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী হিসেবে তাদের এই অংশগ্রহণ প্রত্যক্ষ ও প্রচ্ছন্ন উভয় প্রকারই হতে পারে। প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক ব্যবস্থা বা ক্ষমতাসীন সরকারের পক্ষে ও বিপক্ষে তারা নানাভাবে নানা আন্দোলনে সামিল হতে পারে। কিন্তু সামরিক বাহিনীর ক্ষেত্রে সচরাচর এটা দেখা যায় না। একালের গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে তো বটেই এমনকি অস্বাভাবিক বা আপৎকালীন পরিস্থিতিতেও সামরিক বাহিনীর দ্বারা রাজনৈতিক সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করার বিষয়টি আড়ালে থাকে।

সামাজিক ও রাজনৈতিক স্থিতাবস্থাই শুধু নয় তার পরিবর্তনের প্রক্রিয়া-পদ্ধতি সম্পর্কে তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ দেওয়ার চেষ্টা সমাজবিজ্ঞানী মহলে বিশেষ জনপ্রিয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার সদ্যস্বাধীন দেশগুলির সমাজ-রাজনীতিক পটভূমিতে অস্থিরতা ও অস্থিতাবস্থা এবং তার গতিপ্রকৃতি বিশ্লেষণে সমাজবিজ্ঞানীরা সামরিক বাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে বেশকিছু গবেষণা করেছেন।

সাধারণভাবে বলা যায়, যে-কোনও রাজনৈতিক ব্যবস্থাই সামরিক বাহিনীকে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রাখতে চায় এবং রাজনীতিক প্রক্রিয়ার উপর সামরিক বাহিনীর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়াকে সাধারণভাবে একটি অস্বাভাবিক ঘটনা বলে মনে করা হয়। কিন্তু পশ্চিমের উন্নত রাষ্ট্রগুলো সামরিক বাহিনীর উপর অসামরিক রাজনৈতিক কর্তৃত্বকে যতটা সাফল্যের সাথে বজায় রাখতে পারে উন্নয়নশীল বা অর্ধোন্নত দেশগুলোর ক্ষেত্রে নানা বাস্তব পরিস্থিতিগত কারণে তা সম্ভভব হয় না। উন্নয়নশীল দেশসমূহে সমাজ-রাজনীতিক পরিবর্তন একদিকে যেমন আভ্যন্তরীণ ঘটনাপ্রবাহের সাথে সম্পর্কিত তেমনি এর সঙ্গে বাহ্যিক পরিবেশের যোগও উপেক্ষণীয় নয়। বস্তুত, অনুন্নত অথবা উন্নয়নশীল দেশগুলির পরিবর্তন প্রক্রিয়া বহুলাংশেই বাহ্যিক পরিবেশের দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়। আর এইসব বাহ্যিক চাপ—জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উভয়ত—প্রতিহত করতে অসামরিক সরকারকে বহুক্ষেত্রেই সামরিক বাহিনীর প্রত্যক্ষ সাহায্যের উপর নির্ভর করতে হয়।

রাজনীতির ক্ষেত্রে সামরিক বাহিনীর ভূমিকা সমধর্মী বা সমরূপ নয়। এই ভূমিকার ক্ষেত্রে নানা তারতম্য লক্ষিত হয়। এই তারতম্য প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে Alan R. Ball এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যে, রাজনীতিতে সামরিক বাহিনীর ভূমিকা মূলত দু'টি পরিবর্তনীয়ের (variable) উপর নির্ভরশীল। পরিবর্তনীয় দু'টি হল : (১) সামরিক বাহিনীর প্রকৃতি; (২) অসামরিক সরকারের শক্তিসামর্থ্য। অন্যভাবে বলা যেতে পারে, উপরোক্ত দু'টি পরিবর্তনীয়ই রাজনীতিতে সামরিক বাহিনীর ভূমিকার নির্ধারক শক্তি।

কোনও একটি দেশের সামরিক বাহিনীর প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য অনেকাংশে তার রাজনীতিক মনোভাব ও ভূমিকাকে প্রভাবিত করে। সাধারণত সামরিক বাহিনী দেশের অন্যান্য অসামরিক বাহিনীর তুলনায় অধিক পেশাদারী মনোভাবসম্পন্ন। এই পেশাদারী ও শৃঙ্খলাপরায়ণ মনোভাবের উপর ভিত্তি করে সামরিক বাহিনীর নিজস্ব আত্মমর্যাদাবোধ ও অন্যান্য সামাজিক গোষ্ঠী থেকে নিজেদের স্বতন্ত্র চেতনা গড়ে ওঠে। কোনও কোনও দেশের সামরিক বাহিনীর এই পেশাদারিত্ব ও স্বাতন্ত্র্য-চেতনা অন্যদেশের সামরিক বাহিনীর তুলনায় বেশি অথবা কম হতে পারে। আবার বাধ্যতামূলক নিযুক্তির ভিত্তিতে গঠিত সেনাবাহিনী এবং স্বেচ্ছামূলকভাবে গঠিত সেনাবাহিনীর মধ্যে পার্থক্যও লক্ষ্য করা যায়। আবার সেনাবাহিনীতে নিযুক্তির ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ সামাজিক বর্গের সংখ্যাধিক্য দেখা যায়। কোনও কোনও দেশের সামরিক বাহিনী নিয়োগের ব্যাপারে যেমন এলিট বর্গভুক্তের উপর জোর দেওয়া হয় তেমনি আবার অন্য কোনও কোনও দেশে সামরিক বাহিনীর নিয়োগের ক্ষেত্রে জোর দেওয়া হয় কৃষিজীবী সম্প্রদায় ও নিম্ন-মধবিত্তের উপর। এই সামাজিক বর্গগত পার্থক্যের দরুন সামরিক বাহিনীর মানসিকতা ও প্রবণতার পার্থক্য সূচিত হয়। এছাড়াও বিভিন্ন দেশের সামরিক বাহিনীর বিশেষজ্ঞতা, প্রযুক্তিগত দক্ষতা ও প্রশাসনিক বিচক্ষণতার ক্ষেত্রে তারতম্য থাকে বলে সামরিক বাহিনীর শক্তিসামর্থ্যের পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। সামরিক বাহিনীর রাজনৈতিক ভূমিকার নির্ধারক শক্তি হিসেবে তাই উপরোক্ত পরিবর্তনীয়টি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সামরিক বাহিনীর রাজনৈতিক ভূমিকার দ্বিতীয় নির্ধারক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক ব্যবস্থার গতিপ্রকৃতিও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। শিল্পোন্নত উদারনীতিবাদী গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় অথবা একক রাজনৈতিক দলের সামগ্রিক নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের রাজনীতির ক্ষেত্রে সামরিক বাহিনীর প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপের সম্ভাবনা তেমন থাকে না। অন্যদিকে যে সমস্ত রাষ্ট্রব্যবস্থায় অসামরিক সরকার জনসাধারণের ব্যাপক অংশের আনুগত্য অর্জনে ব্যর্থ হয় ও মর্যাদা হারায় সেইসব রাষ্ট্রে সামরিক বাহিনীর প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপের সম্ভাবনা বেশি হয়। কিন্তু অসামরিক সরকার সাধারণভাবে যে বৈধতা ভোগ করে কোনও সামরিক বাহিনীর ক্ষেত্রে সচরাচর তা দেখা যায় না। তাই বলা চলে যে অসামরিক সরকারের মারাত্মক রকম দুর্বলতা বা ব্যর্থতা না থাকলে সামরিক বাহিনীর হস্তক্ষেপ সফল হওয়ার সম্ভাবনা কম।

প্রকৃতপক্ষে অসামরিক সরকার ও সামরিক বাহিনীর পারস্পরিক সম্পর্ক 'রাজনীতিতে সামরিক হস্তক্ষেপ'-এর মতো একমাত্রিক ধারণার দ্বারা উপলব্ধি করা যাবে না। রাজনীতির সাথে সামরিক বাহিনীর বহুমাত্রিক ও জটিল সম্পর্কটিকে যথাযথ অনুধাবণ করতে তাই একে তিনটি পর্যায়ে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। রাজনীতিক প্রক্রিয়ার সামরিক বাহিনীর প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধির পরিমাণগত মাত্রা ও গুণগত পর্যায় অনুযায়ী রাষ্ট্রবিজ্ঞানী Alan R. Ball একে মুখ্যত তিনটি স্তরে ভাগ করেছেন :

৩২.৫.১ সামরিক বাহিনীর প্রচ্ছন্ন ও সীমিত হস্তক্ষেপ

আপাতবিচারে রাজনীতিক ক্রিয়াপ্রক্রিয়া ও সামরিক বাহিনীর কর্মধারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন মনে হলেও একথা অনস্বীকার্য যে, সামরিক বাহিনী প্রচ্ছন্নভাবে হলেও সরকারি নীতিকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করে। বিশেষত সরকারের পররাষ্ট্রনীতি ও প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত নীতিকে প্রভাবিত করার ব্যাপারে সামরিক বাহিনী বিশেষভাবে উদ্যোগী হয়। একথা বলা বাহুল্য যে, সরকারের পররাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষা নীতির সঙ্গে অন্যান্য নীতির প্রত্যক্ষ না হলেও পরোক্ষ সম্পর্ক বর্তমান এবং ফলত ঐ দুই নীতির উপর সামরিক বাহিনীর প্রভাব পরোক্ষে সরকারের অন্যান্য নীতিকেও প্রভাবিত করে।

উপরন্তু, একটি চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী হিসেবে সামরিক বাহিনী নিজেদের পেশাগত দাবীদাওয়া, চাকুরির শর্তাদি এবং আনুষঙ্গিক সুযোগসুবিধা সরকারের কাছ থেকে আদায়ের ব্যাপারে সচেষ্ট থাকে। যেকোনও রাজনৈতিক ব্যবস্থাতেই সামরিক বাহিনী এ ধরনের সীমিত হস্তক্ষেপের সুযোগ পেয়ে থাকে। এ ধরনের সীমিত হস্তক্ষেপের মুখ্য উদ্দেশ্যই হল পররাষ্ট্র বা প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত কোনও সরকারি নীতিকে নিজেদের পছন্দসইভাবে সরকারের মাধ্যমে রূপায়িত করা এবং সামরিক বাহিনীর সদস্যদের দাবীদাওয়া পূরণের ব্যবস্থা করা।

রাজনীতিক সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় সামরিক বাহিনীর সীমিত হস্তক্ষেপের সুযোগ ও সম্ভাবনা সব দেশে সমান নয়। সাধারণভাবে যদিও উদারনীতিবাদী গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় অসামরিক কর্তৃপক্ষের নির্দেশ ও নিয়ন্ত্রণে সামরিক বাহিনী পরিচালিত হয় তবু এই নিয়ন্ত্রণ সব দেশে সমানভাবে কার্যকর বা কঠোর হয় না যেহেতু সকল উদারনীতিবাদী গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ভিত ও কাঠামো সমান মজবুত ও সমান ঐতিহ্যসিদ্ধ নয়। তবু মোটের উপর এ কথা বলা যায় যে, গ্রেট ব্রিটেন অথবা ভারতবর্ষের মতো উদারনীতিক ব্যবস্থায় এবং গণ- প্রজাতান্ত্রিক চীনের মতো একদলীয় সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় অসামরিক সরকারের বৈধতাকে সামরিক বাহিনী কখনও তেমন চ্যালেঞ্জ জানায়নি।

তবে যুদ্ধকালীন বা অন্য কোনও আপৎকালীন পরিস্থিতিতে অসামরিক ও সামরিক কর্তৃপক্ষের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের ব্যাপারটি কিছুটা ভিন্ন মাত্রা লাভ করে। সম্পর্কের এই ভিন্ন মাত্রা আসলে একান্তভাবে অস্বাভাবিক বা জরুরি অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এক ব্যতিক্রমী মাত্রা।

এই প্রসঙ্গে অবশ্য আর একটি কথাও মনে রাখা দরকার যে, সমাজতান্ত্রিক ও অন্যান্য একদলীয় রাষ্ট্রব্যবস্থায় সামরিকবাহিনী ছাড়াও অন্যান্য আধা-সামরিক সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তোলা হয়। আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে নিরাপত্তারক্ষা, সংকট দূরীকরণ ও সামরিক অভ্যুত্থানের আশঙ্কা প্রতিহত করতে এইসব বাহিনীকে ব্যবহার করা হয়। আবার নাৎসীবাদী বা ফ্যাসিবাদী স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ক্ষমতাসীন নেতার রাজনীতিক প্রভাব-প্রতিপত্তিকে সুনিশ্চিত করার জন্য এরকম বাহিনী গঠন করা হয়।

সামরিক কর্তৃপক্ষ ও অসামরিক কর্তৃপক্ষের পারস্পরিক সম্পর্কের আর এক বিকল্প মাত্রা হল রাজনীতিতে সামরিক বাহিনীর প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ। কিন্তু রাজনীতিতে এই প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপের পরিপূর্ণ সামরিক শাসন বলে

মনে করলে ভুল হবে। বস্তুত, এ হল মধ্যবর্তী অবস্থা। দেশের রাজনীতিক প্রক্রিয়ায় সামরিক বাহিনীর সীমিত হস্তক্ষেপ এবং পূর্ণাঙ্গ সামরিক নিয়ন্ত্রণ বা শাসনের এক মধ্যবর্তী অবস্থাকেই প্রত্যক্ষ সামরিক হস্তক্ষেপ বলে চিহ্নিত করা যায়।

রাজনীতিতে প্রত্যক্ষ সামরিক হস্তক্ষেপ নানা কারণে ও নানা উদ্দেশ্যে ঘটতে পারে এবং এ জাতীয় ঘটনা যে-কোনও রাজনৈতিক ব্যবস্থাতেই ঘটা সম্ভভব। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী Ball-এর অভিমত : "Direct interference by the military in politics, but falling short of the assumption of power by the military may occur in any type of political system." তবে প্রধানত যে দু'টি কারণে বা উদ্দেশ্যে সামরিক বাহিনী রাজনীতিতে প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপে উদ্যোগী হয় তা হল : (১) সামরিক বাহিনীর কোনও সংকীর্ণ গোষ্ঠীগত স্বার্থসাধন এবং (২) অসামরিক সরকারের চূড়ান্ত ব্যর্থতা, দুর্নীতি অথবা কোনও কায়েমি স্বার্থের অনুকূলে শাসন চালানোর চেষ্টাকে প্রতিহত করতে। তবে লক্ষ্যণীয় হল, উপরোক্ত এই উভয় ক্ষেত্রেই সামরিক বাহিনী নিজেকে সমষ্টিগত জাতীয় স্বার্থের প্রতিভূ ও রক্ষক হিসেবেই প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করে। অর্থাৎ, যখন সামরিক বাহিনী নিজেদের সংকীর্ণ গোষ্ঠীস্বার্থেও রাজনীতিতে প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ করে তখনও ব্যাপক জনসমর্থন লাভের প্রয়োজনে এবং বৈধতা অর্জন করতে তার এই হস্তক্ষেপ প্রয়াসকে সমষ্টিগত স্বার্থেই অনুপ্রাণিত বলে জাহির করে।

রাজনীতিতে সামরিক বাহিনীর এই ধরনের হস্তক্ষেপ সাধারণত ক্ষমতাসীন কোনও অসামরিক সরকারকে অপসারিত করে পছন্দসই অন্য এক অসামরিক সরকারকে প্রতিষ্ঠা করতে উদ্যোগী হয়। ১৯৬৪ সালে কেনিয়া, তানজানিয়া ও উগান্ডায় সংঘটিত সামরিক বাহিনীর বিদ্রোহী ভূমিকার কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। সামরিক বাহিনীর এই বিদ্রোহের মূলে যেসব কারণ বর্তমান ছিল তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল বেতন ও কাজকর্মের অবস্থা সম্পর্কে সামরিক বাহিনীর মধ্যে অসন্তোষ, সামরিক বাহিনীর উচ্চপদগুলিতে আফ্রিকানদের নিয়োগের দাবী ইত্যাদি। তবে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষকে উৎখাত করার সজ্ঞান অভিপ্রায় বা পরিকল্পনা সামরিক বাহিনীর ছিল না। আফ্রিকার সদ্যস্বাধীন আরও কয়েকটি দেশে ৬০-এর দশকে এ জাতীয় সামরিক বিদ্রোহ ও হস্তক্ষেপ বিষয়ে অনুসন্ধান করে কোনও সর্বজনীন কারণ খুঁজে পাওয়া যায়নি। তবু মোটের উপর বলা যায়, সামরিক বাহিনীর সদস্যদের দীর্ঘকালীন অসন্তোষের সমাধানে রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের ব্যর্থতা, রাজনীতিক ও অন্যান্য ক্ষেত্রে দীর্ঘকালীন অচলাবস্থা ও সংকটের নিরসনে অক্ষমতা ইত্যাদি সামরিক বাহিনীর এই ধরনের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপে প্ররোচিত করে। তবে পূর্ণাঙ্গ সামরিক শাসন প্রতিষ্ঠার চেষ্টা প্রায় বিরল।

পূর্ণ সামরিক নিয়ন্ত্রণ অথবা 'সামরিক শাসন' বলতে এমন এক অবস্থার কথা বোঝায় যেখানে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব বা সরকারি ক্ষমতা সামরিক বাহিনীর দখলে থাকে। অবশ্য সামরিক শাসনাধীনে সামরিক নিয়ন্ত্রণের মাত্রায় ও ঐ নিয়ন্ত্রণের রীতি পদ্ধতিতে পার্থক্যের দরুন সামরিক শাসনেরও রকমফের হতে পারে। মধ্যপ্রাচ্য, দক্ষিণপূর্ব এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার কোনো কোনো দেশের রাজনীতিতে ঘন ঘন সামরিক নিয়ন্ত্রণ বা শাসন কার্যকরী হওয়ার মূলে কতকগুলি পরিস্থিতিকে চিহ্নিত করা যায়।

সাধারণত দেশের অসামরিক শাসক ও রাজনীতিবিদ্‌রা যদি অযোগ্য ও দুর্নীতিপরায়ণ হন এবং জনমানসে যদি তাঁদের সম্পর্কে আস্থা ও শ্রদ্ধার বোধ ক্রমশ নিম্নগামী হয় তবে অন্য বিকল্পের অভাবে জনগণ সামরিক বাহিনীর হস্তক্ষেপকে স্বাগত জানাতে পারে। দীর্ঘকাল ধরে সমাজে জনগণের মৌলিক দাবীদাওয়াগুলি যদি ক্রমাগত অবহেলিত থাকে এবং অসামরিক রাজনীতিবিদ্‌, প্রশাসক ও সমাজে কায়েমি বিত্তগোষ্ঠীর অশুভ জোটের ফলে যদি সমাজজীবনে অনিশ্চয়তা, হতাশা ও বিশৃঙ্খলা পরিব্যাপ্তি লাভ করে তবে সামরিক বাহিনীর পক্ষে ক্ষমতা দখলের ক্ষেত্রে জনগণের সক্রিয় সমর্থন না থাকলেও অন্তত নিষ্ক্রিয় অনুমোদন থাকে। তবে এই অনুমোদন স্থায়ী হতে পারে না কারণ দেখা গেছে প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই সামরিক শাসক জন-বিরোধী ভূমিকা নিতে তৈরি থাকে।

উপরন্তু, কোনও কোনও রাষ্ট্রে আঞ্চলিক ও জাতিগত (ethnic) ভিন্নতার দরুন নানা সংকটের সৃষ্টি হয়, এবং এই ধরনের জাতীয় ও রাষ্ট্রিক সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে সামরিক বাহিনী প্রত্যক্ষভাবে ক্ষমতা দখলের জন্য তৎপর হয়। স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে নাইজেরিয়ায় সামরিক একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার ঘটনাকে এ প্রসঙ্গে দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করা চলে। তাছাড়াও বিশ্বের নানা সদ্যস্বাধীন রাষ্ট্রে, বিশেষত যেসব রাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি আনুগত্যের বদলে জাতিগোষ্ঠীগত বা উপজাতিগত আনুগত্যের কারণে রাষ্ট্রিক সংহতি শিথিল সেইসব রাষ্ট্রেও প্রত্যক্ষ সামরিক নিয়ন্ত্রণ কায়েম হবার সম্ভাবনা অধিক।

তাছাড়াও সদ্যস্বাধীন বহু দেশে নবগঠিত রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠানসমূহ শুরুতে প্রতিশ্রুতির মাধ্যমে বিপুল প্রত্যাশা সৃষ্টি করেও যদি দীর্ঘদিন ধরে দেশের আর্থিক ও সামাজিক অনগ্রসরতার সমাধানে ব্যর্থ হয় ও জনগণের মুখ্য অংশের জোরালো আপাত চাহিদাগুলোকে তৃপ্ত না করতে পারে তবে জনগণের পুঞ্জিভূত অসন্তোষকে কাজে লাগিয়ে ঔপনিবেশিক উত্তরাধিকারে গড়ে ওঠা সামরিক বাহিনী নিজেকে দেশের ত্রাতা হিসেবে প্রতিষ্ঠায় প্রয়াসী হয়।

আবার তৃতীয় বিশ্বের বহু অনুন্নত দেশ নিজেদের সামরিক বাহিনীর আধুনিকীকরণ ও প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত কাজে পশ্চিমী শক্তিবর্গের উপদেশ ও সহায়তা গ্রহণে উদ্যোগী হয়। ফলস্বরূপ ঐসব বৃহৎশক্তি তাদের স্বার্থবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা গ্রহীতা দেশের সামরিক বাহিনীকে প্রভাবিত করতে পারে। এবং কখনও কখনও এইভাবে বৈদেশিক মদতপুষ্ট হয়ে সামরিক বাহিনী সামরিক শাসন প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হয়।

সবশেষে আর একটি কথা মনে রাখা উচিত, অনেক সময় সামরিক ও অসামরিক কর্তৃপক্ষ যুগ্মভাবে সরকারি কার্য পরিচালনার কৌশল অবলম্বন করে। বস্তুত, সামরিক শাসকরা নিজেদের সামরিক কর্তৃত্বের প্রতি জনগণের সহনীয়তা ও সমর্থন আদায় করতে এরকম সামরিক-অসামরিক যৌথ সরকার গঠনের পথ ধরে।

রাজনীতিক প্রক্রিয়া পদ্ধতি ও সামরিক বাহিনীর কর্মধারা সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী হলেও উভয়ের মধ্যে পরোক্ষ, কখনওবা প্রত্যক্ষ সম্পর্ক বর্তমান। বস্তুত, রাজনীতিক প্রক্রিয়ায় সামরিক বাহিনী অবশ্যই পরিপূরক ভূমিকা

সম্পাদন করে। আর এই পরিপূরক ভূমিকার সুবাদে সামরিক বাহিনী রাজনীতিক সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়াকে প্রবাবিত করে নানাভাবে।

কিন্তু কখনও কখনও এই পরিপূরক ভূমিকাই রাজনীতিতে এক মুখ্য ভূমিকা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয় যখন সামরিক বাহিনী বিশেষ বিশেষ সংকটকালীন পরিস্থিতিতে রাজনীতিক প্রক্রিয়ায় প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপের সুযোগ পায়, অথবা যখন অভ্যুত্থানের মাধ্যমে সামরিক বাহিনী রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করে। অবশ্য বিশ্বের বিভিন্ন ধরনের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সামরিক বাহিনীর এই প্রাধান্য বিস্তারের সুযোগের তারতম্য লক্ষ্য করা যায়।

১। আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে রাজনীতির মুখ্য উপজীব্য বিষয় কী?

২। কী অর্থে সামরিক বিভাগ রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্কিত?

৩। রাজনীতিতে সামরিক বাহিনীর প্রভাববৃদ্ধির কারণ ও পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করুন।

৪। সামরিক বাহিনীর সাংগঠনিক চরিত্রের বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করুন।

৫। রাষ্ট্রে অন্যান্য চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর সঙ্গে সামরিক বাহিনীর পার্থক্যসূচক বৈশিষ্ট্যগুলি কী?

৬। রাজনীতিতে সামরিক হস্তক্ষেপের নির্দ্ধারক উপাদানগুলি কী কী?

৭। কোন্ কোন্ রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সামরিক বাহিনীর প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপের আশঙ্কা কম, এবং কেন?

৮। অর্ধোন্নত বা অনুন্নত দেশের রাজনীতিতে সামরিক হস্তক্ষেপের সম্ভাবনা কেন বেশি থাকে?

৯। রাজনীতিতে সামরিক বাহিনীর সীমিত হস্তক্ষেপ বলতে কী বোঝায়?

১০। পূর্ণাঙ্গ সামরিক শাসন বলতে কী বোঝায়?

১১। কোন্ কোন্ পরিস্থিতিতে একটি দেশে সামরিক অভ্যুত্থান বা সামরিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়?

১২। রাজনীতিতে প্রত্যক্ষ সামরিক হস্তক্ষেপের সাথে পূর্ণাঙ্গ সামরিক শাসনের পার্থক্য কী?

১। Alan R. Ball : Modern Politics & Government

২। Guttridge W. F. : Military Regimes in Africa

৩। Finer S. S. : Comparative Government

৪। Lucian Pye : Aspects of Political Development

৫। নির্মলকান্তি ঘোষ : আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভূমিকা।

৬। J. C. Johari : Comparative Politics

৭। সুজিতনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় : সামরিক বাহিনী ও রাজনীতি।